সুখের খোঁজে

দীপ্তিময়ী টিম

ফাতিহ প্রকাশন

প্রকাশনা

ফাতিহ প্রকাশন

দোকান নং ৫, কওমী মার্কেট [২য় তলা]

৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ : ০১৬০৬১৭৭৫৭৭

ই-মেইল : fatihprokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

সুখের খোঁজে

লেখক : দীপ্তিময়ী টিম

প্রকাশক : সাগর ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অঙ্গসজ্জা : আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

মূল্য : ২৫০ [দুইশত পঞ্চাশ টাকা]

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, ওয়াফি লাইফ, বইফেরি, বুকস্টার.কম

লেখক ও প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াতের স্বার্থে বইয়ের কোনো অংশব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আমাদের জান্নাত

লাল বেলুন
আফরিন সুলতানা ০৯

ছন্দপতনের এফোঁড়-ওফোঁড়
যাহরাহ্ আয়াত ১৯

প্রাণের বিনিময়ে
উম্মে হানি..... ২৮

ধাপে ধাপে পরিবর্তন
সুরাইয়া আক্তার সুরভী..... ৩৪

আঁখি মেলে দেখো
সানজিদা তাসনিম ৪২

মা বন্ধু
ফিরোজা আয়াত..... ৪৬

আমার জান্নাত আমার ঘরে
শামসুন নাহার তামান্না ৫২

বিনিময়
সীমু আক্তার ৬০

নির্বাসন
ফাহমিদা আফরিন ৬৫

ছিল শতেক আশা
জুলেখা আফরিন ঝিমু..... ৬৯

বুকের মাঝে সমুদ্র
তাওহিদা তাবাসসুম ৭৭
অনুশোচনা
ত্বহেরা তাবাসসুম ৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্লো পয়জন

অবাধ মায়া
আফরিন সুলতানা ৮৫
এ ঘোর আঁধারের
তাওহিদা তাবাসসুম ৯৯
গন্তব্য জান্নাত
উম্মে হানি..... ১০২
স্রোতের বিপরীতে
সানজিদা সাবিহা..... ১১১
ভয়াবহ ফিতনা
আমাতুল্লাহ সিহিন্তা..... ১১৫
শেষ থেকে শুরু
ফাহমিদা আফরিন ১২৪
উপদেশ না, মেসেজ
শামসুন নাহার তামান্না ১২৯
জাস্ট ফ্রেন্ড
ত্বহেরা তাবাসসুম..... ১৩৭
মায়াজাল
সানজিদা তাসনিম ১৪২
আভাহীন ছোঁয়া
জুলেখা আফরিন ঝিমু..... ১৪৫
শর্টকাট ফিতনা
সুরাইয়া আক্তার সুরভী..... ১৫৩

লাল বেলুন

আফরিন সুলতানা

“আপা...আপা! দেখ, আবার বেলুন এসেছে। জলদি আয়।”

শারিনের চিৎকার শুনে মানহা দৌঁড়ে এলো। বরাবরের মতো শোকেসের উপর থেকে গুলতি নিয়ে এসে লাল বেলুনটার দিকে তাক করল।

এক...দুই...তিন...

চটাস করে বেলুনটা ফেটে যাওয়ার সাথে সাথে শারিন এক দৌঁড়ে উঠোনে পৌঁছে গেল। এবারও বেলুনের সাথে একটা চিঠি এসেছে। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা।

শারিন চিঠির কাগজটা পরীক্ষা করল। সাদা রাফ কাগজ। ভেতরে এলোমেলোভাবে কয়েকটা বাক্য লেখা। মানহা তার কাছে আসতেই সে শব্দ করে চিঠিটা পড়তে লাগল।

“হায়, প্রভু! আমার মেয়েকে খুঁজে দাও, খুঁজে দাও! আমার কাছে এনে দাও, এনে দাও!”

পড়া শেষ হতেই সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলল শারিন। কিছু দুঃখ বুকের ভেতর দলা পাকিয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে রইল। কে এই চিঠির লেখক তারা জানে না।

প্রায়ই এরকম বেলুন তাদের বাড়ির আকাশে উড়তে দেখা যায়। মানহা প্রতিবারই সেগুলো তাক করে ধরাশায়ী করে আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ে থাকে। তার খুব জানার কৌতূহল, কে এই অজ্ঞাত লোক? কী হয়েছে তার মেয়ের!

“জানেন আপা, সেরা বাংলাবিদ প্রতিযোগিতায় আমার মেয়ে এবার টেলিভিশনে যাচ্ছে। দোয়া করবেন কিন্তু,”বলে রুমকির মা ঝুমুর মায়ের দিকে তাকালেন।

“জি, অবশ্যই আপা,” একটু ইতস্ততবোধ করে ঝুমুর মা বললেন।

তারা প্রতিবেশী। তাছাড়া দুজনের মেয়ে একই স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। আজ মেয়েদের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল জানতে তারা স্কুলে এসেছেন।

ঝুমুর মা সহজ-সরল ধরনের মহিলা হলেও রুমকির মা বিপরীত স্বভাবের। সবকিছুতে নিজের বড়ত্ব দেখানোই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই যে রুমকি মেধাবী একটা মেয়ে। তার কৃতিত্বের জন্য অন্য অভিভাবকদেরকে তিনি পাত্তা দিতে চান

প্রাণের বিনিময়ে

উম্মে হানি

ছাদের রেলিংয়ে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মায়াবী চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আছে রাহাত। ভাবলেশহীন মুখ, চোখের দৃষ্টি স্থির! গত সপ্তাহে তার জীবনের সবচেয়ে বড় অঘটনটা ঘটে গেছে। বাবা হার্ট অ্যাটাক করে দুনিয়ার ওপারে চলে গেছেন।

ভদ্র, সজ্জন ব্যবসায়ী পিতা কখনোই ভাবতে পারেননি ছেলেটা এমন বখে যাবে, তার সাথে চিৎকার করে কথা বলবে। অথচ শিক্ষা-দীক্ষায়, আদর-যত্নে কখনোই কোনো ত্রুটি রাখেননি তিনি। ছোটবেলা থেকেই মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন কুরআনে কারিমের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত। পড়াশোনায়, ভদ্রতায় সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল ছেলেটা। তাকে ঘিরে কত-শত স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, ডাক্তার বানাবেন ওকে। তারপর নিজ গ্রামে দুস্থ মানুষদের জন্য বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতাল তৈরি করবেন।

আল্লাহ তাকে টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন ভালোই। তবু গ্রামে সুচিকিৎসার অভাবে মাত্র বার্ধক্যে পা দেওয়া বাবাকে বাঁচানো যায়নি। সেই থেকে রাহাতকে ঘিরে তিনি এই স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তা আর হলো কই!

রাহাতের পরিবর্তনটা এসেছিল অষ্টম শ্রেণির মাঝামাঝি সময়ে। সে বাবার কাছে মোবাইল চেয়েছিল। ছেলের কথা শুনে বাজারের বড় ব্যবসায়ী শরীফ আহমাদ সত্যি সত্যি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কারণ জানতে চাইলে রাহাত বলল, "প্রতিদিনই কোচিংয়ের জন্য পাশের এলাকায় যেতে হয়, যেটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে। এজন্য আম্মু সবসময় টেনশন করেন। মোবাইল থাকলে আম্মু খোঁজ রাখতে পারতেন। আর আমিও পড়াশোনার জন্য ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে পারতাম। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক সুবিধা হতো আমার।"

"সেগুলো কী ধরনের সুবিধা?" জানতে চাইলেন শরীফ আহমাদ।

ধাপে ধাপে পরিবর্তন

সুরাইয়া আক্তার সুরভী

আজ আমার গর্ভের সন্তানের নয় মাস পূর্ণ হলো। আজকাল শরীরটা ভীষণ ভারী লাগে। খেতে পারি না। চলতে পারি না। তবুও আমার সন্তানের প্রতি বিরক্তি আসে না। দিন যত যাচ্ছে, আমার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্তান আর বাবা-মায়ের ভালোবাসাকে পৃথিবীর অন্যতম ভালোবাসা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেখানে থাকে না কোনো স্বার্থ। সেই ভালোবাসা অতুলনীয়।

আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা আমার সন্তানকে নিয়েই কুরআন তেলাওয়াত করি। আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন তেলাওয়াতে যে প্রশান্তি আছে, সেই প্রশান্তি আমার পুরো দিনটাকে সুন্দর করে তোলে। তাছাড়া আমার শাশুড়ির কাছ থেকে শুনেছি, গর্ভাবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা কুরআন তেলাওয়াত করা বাচ্চার মানসিক বিকাশের জন্য খুবই উপকারী।

আমি রুম্মান। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ঠিক দুই বছর হলো আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার রহমতে হেদায়াতের পথ বুঝতে শিখেছি। আর তারই রহমতে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি একজন মুত্তাকী। আমার শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকেই ধার্মিক; আলহামদুলিল্লাহ আ'লা কুল্লি হাল। তাদের দেখলে আমার পূর্বের জীবন নিয়ে অনেক আফসোস হয়। আল্লাহুম্মাগফিরলি! জীবনের কতকগুলো বছর এমন হেলায়ফেলায় পার করেছি।

হ্যাঁ, আমি জন্মগতভাবে মুসলিম। সেই হিসেবে নামাজ, রোজা টুকটাক পালন করতাম। কিন্তু এর বাইরেও যে ইসলামে কিছু আদেশ-নিষেধ আছে সেই বিষয়ে আমার সঠিক জ্ঞান ছিল না।

আমি কেমন হবো, আমার ব্যবহার কেমন হবে, সবটাই নির্ভর করে আমার পরিবারের উপর। এতটা আদর, ভালোবাসা আমার দরকার ছিল না। যার জন্য— আমার দুনিয়া আখিরাত দুটোই নষ্ট হয়। আবার কোনো কোনো সময় পরিবারের জন্য আমাদের দুনিয়া হাসিল হলেও আখিরাতটা ছুটে যায়। আমার আখিরাতটাও ছুটে যেতে যেতে বেঁচেছে।

আঁখি মেলে দেখো

সানজিদা তাসনিম

টেবিলে বসে পড়ছি, এমন সময় মা এসে এক কাপ চা আর পিরিচে কয়েকটা বিস্কুট রেখে গেলেন। দরজার কাছাকাছি গিয়েও কী যেন মনে করে তিনি ফিরে এসে বিছানায় বসলেন। বসেই বাচ্চাদের মতো পা দুলাতে লাগলেন। এটার অর্থ হলো, তিনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। তার যখন কিছু বলার থাকে, তখন তিনি এভাবে বিছানায় বসে পা দুলাতে থাকেন।

আমি বললাম, "কিছু বলবে, মা?"

"না, কিছু বলব না। চা'টা খেয়ে নে। ঠান্ডা হয়ে যাবে। টিউশনিতে কখন যাবি?"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, "আজ যাব না। স্টুডেন্টের বাসায় নাকি মেহমান আসবে, তাই কালকে পড়াতে যেতে বলেছে। তুমি খাবে না?"

মা বললেন, "না, ইচ্ছে করছে না।"

আমি বুঝতে পারলাম, কোনো কারণে মায়ের মন খারাপ হয়েছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু বলছেন না। নিজেই জানতে চাইলাম, "মা, রাতে কী তরকারি রান্না করছো?"

"বাঁধাকপি, আলু দিয়ে সবজি আর মাছ রাঁধব।"

"বাহ! আচ্ছা মা, অনেকদিন সকালে খিচুড়ি রাঁধোনি। রোজ একই নাশতা খেয়ে আর ভালো লাগছে না। কাল সকালে নাশতায় গরম গরম খিচুড়ি আর আচার খাই, কী বলো? তাছাড়া কাল তো শুক্রবার। সবার ছুটি।"

"তোরা তো সকালে কেউ উঠিস না। আমারও কতদিন থেকে খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে। সবাই একসাথে বসে খাব। কিন্তু তুই উঠিস একসময়, তোর বাবা একসময় আর তোর ভাই আরেক সময়। একসাথে না খেলে কি ভালো লাগে?" মায়ের কথায় স্পষ্ট অভিমানের সুর।

মায়ের কথা শুনে আমার খুব মন খারাপ হলো। যেন মা আমার কাছে নালিশ দিলো। তারও তো একটু মন চায় সবার সাথে বসে নাশতা করতে, নিজের পছন্দের কিছু বানাতে। কিন্তু আমাদের জন্যই সম্ভব হয় না।

মা বন্ধু

ফিরোজা আয়াত

গভীর রাত। টিনের চালে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ। চারিদিকে গা ছমছমে নীরবতা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সুন্দরতম দুটি শব্দকে আমি পাশাপাশি রাখছি- মা এবং বন্ধু।

আম্মাজান খাদিজা, সম্মানিত প্রিয় মা আমার! মা-বন্ধু বলে যদি কাউকে কল্পনা করতে হয়, তবে এই মুহূর্তে আপনিই আমার কাছে সেরা উদাহরণ। সব বাবা-মা সন্তানদের জন্য বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজনগুলোর জোগানদাতা হতে পারে। কিন্তু সন্তানদের আবেগ, অনুভূতি ও মানসিক প্রয়োজনগুলো খুব কম বাবা-মা'ই পূরণ করতে পারেন।

ছিপছিপে গড়নের সাদামাটা শ্যামবর্ণের এক সরলা নারী আমার মা। ছোটবেলায় যখন কেউ আমার মাকে পাগল বলতো, তখন আমার হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করতো। সমাজের এক বস্তাপঁচা নোংরা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মায়ের লড়াই করা দেখতে দেখতে আমি বেড়ে উঠেছি। জীবন কতটা দুঃসাহসিক, মাকে দেখেই তা অনুভব করতে পেরেছি।

ছোট বেলায় যখন বাবা আমার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগতেন। মা তখন বাবার অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেও আমাকে রক্ষা করতেন। গ্রামের এক অশিক্ষিত নারী হয়েও আমার মা আমাকে কখনো কটাক্ষ করেননি। শাসনের নামে কখনো নির্যাতন করেননি।

আমার মা এক কথায় অতুলনীয়। তিনি খুবই শান্তিপূর্ণ মেজাজের মানুষ। তার প্রতি আমার ভালোবাসার পরিমাণ ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমার হৃদয়রাজ্যে তার অবস্থান অটুট। পৃথিবীতে একমাত্র তার কাছ থেকেই আমি নিঃস্বার্থ ও নিখাঁদ ভালোবাসা পেয়েছি। আমার ইচ্ছে মায়ের কাছে সবসময় মূল্যায়ন পেয়েছে। কখনো কোনো আবদার পূরণ না করতে পারলে বুঝিয়ে বলেছেন।

জীবনের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে আছে বিষ্মতার অসংখ্য জাল। আমার উচ্ছল তারুণ্য আর প্রাণের নবীন উদ্দীপনায় পার হতে হয়েছে সেই সব ব্যাঘাতের দৃঢ় দেয়াল। তারুণ্যের চঞ্চলতা, বয়সের অপরিপক্কতার দরুন অনেক সময়ই আমি আমার মায়ের বিরক্তবোধের কারণ করেছি। মায়ের স্থির দৃঢ়ব্যক্তিত্ব আর অপরিসীম স্নেহে সেই চাপল্যকে আমার মা সংযত করে আদর্শ পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমার

আমার জান্নাত আমার ঘরে

শামসুন নাহার তামান্না

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করছে, সেই সাথে পিনপতন নীরবতা। প্রকৃতি হয়তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মধ্যরাত কি-না বুঝতে পারছি না। না, সবকিছু একেবারে নীরব নয়। একটা শব্দ খানিক পরপর কানে দোল খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ধীরে ধীরে শব্দটা জোরালো হচ্ছে। বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা তো বায়োলজি ক্লাসে স্যারের পড়ানোর শব্দ। এই তো আস্তে আস্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি এখন বেলা বারোটা বাজে? হতে পারে। আজ কী বার? আজকে কি স্যারের ক্লাস ছিল? উফ! কিছু মনে করতে পারছি না কেন!

এমন সময় স্যার বলতে শুরু করলেন, "আমরা সেপিয়েন্স। হোমো সেপিয়েন্স। সুবিশাল মহাবিশ্বের সর্পিলাকার গ্যালাক্সির এক সৌভাগ্যময় এলাকায় আমাদের নিবাস। এই এলাকার আদুরে নাম গোলডিলকস জোন। কীভাবে এই মহাবিশ্বের সূচনা ও বিকাশ হলো, নীলনয়না এই গ্রহে আমরা কবে এলাম, কীভাবে এলাম– এসব চিরাচরিত জিজ্ঞাসার উত্তর তোমরা হয়তো শুনেছো। হালফিলে বিজ্ঞান দিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর না দিলে অনেকের কাছেই স্বাদটা কেমন যেন পানসে মনে হয়। তোমরা জেনেছো, পৃথিবীর অবস্থাকে জগতের কেন্দ্র থেকে এক কোনায় ঠেলে দিয়েছিলেন কোপারনিকাস। কিন্তু তারপরও আমাদের বিশেষত্ব ক্ষুণ্ন হয়নি– এটা মনে হয় জানো না। ডারউইন এসে বোঝালেন– আমরা আলাদা কিছুই না, বরং অন্য পশুর মতোই। তবুও আমাদের স্বপ্নগুলো ধূসর হলো না। আমরা এখনো স্বপ্ন দেখি, গল্প–কবিতা লিখি, কল্পনার নীলাম্বর জগতে ঘুড়ি উড়িয়ে দিই। বিজ্ঞানের সুধা পান করে তোমরা অনেক কিছুই জেনেছো, আবার অনেক কিছুই জানোনি।

"কী জানোনি, কেন জানোনি, জানা কি দরকার? তোমার চিন্তার বাতায়নে মিষ্টি হাওয়া হয়ে মুখরিত হতে চাই, কানে কানে বলতে চাই– এসো আমাদের গল্পটা আরো একবার শুনি। একটু ভিন্ন ধাঁচে, একটু ভিন্ন রঙে। আমরা হোমো সেপিয়েন্স, আর এটা আমাদের গল্প।"

এরপর স্যার বোর্ডে খচখচ করে কিছু একটা লিখতে শুরু করলেন।

ছিল শতেক আশা

জুলেখা আফরিন ঝিমু

অফিস শেষে প্রায়ই বৃদ্ধাশ্রমে যেতাম। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়াটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মা যখন মারা যান, আমি তখন সবেমাত্র চাকরি পেয়েছি।

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ছিলাম। মায়ের কষ্ট খুব কাছ থেকে দেখেছি। চাকরিটা পেয়ে ভেবেছিলাম মাকে এবার স্বস্তি দেবো। তা আর হয়ে উঠল না। চাকরি পাওয়ার এক মাসের মাথায় মা দুনিয়া ত্যাগ করলেন।

মায়ের এত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও কম জ্বালাইনি। তখন বুঝতাম না। এখন বসে বসে আক্ষেপ করি। আজ বাড়ি, গাড়ি সব হয়েছে, কিন্তু মা নেই। মায়ের কথা মনে পড়লেই বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাই।

বাবাও কম কষ্ট করেননি। তিনি ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। আমার বড় ভাই চাকরি পাওয়ার পর বিয়ে করে বিদেশে চলে যান। ছোট তিন বোন এবং আমার খরচ চালাতে বাবা হিমশিম খেতেন। স্কুলের কাজ শেষ করে জমি চাষ করতেন। তখন এসবের মর্ম বুঝতে পারিনি।

বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে তার সিংহভাগ রেখে দেওয়া হতো আমাদের জন্য। মা তো আমাদের সাথে খেতেই চাইতেন না। তখন বুঝতাম না, কেন তিনি পরে খেতেন। বাবার পাতে মাছের মাথা দিলে তিনি সেটা আমার জন্য রেখে দিতেন। অথচ একদিন টিফিনের টাকা দেওয়া মিস হয়ে গেলে সেই বাবার সাথেই চড়া মেজাজ দেখাতাম। এখন তো সবই বুঝি। শুধু যাদের জন্য মন উজাড় করে কিছু করতে ইচ্ছা করে তারাই দুনিয়াতে নেই।

ক'দিনেই অনেক বৃদ্ধার সাথে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। আমি গেলেই আমাকে এটা সেটা খেতে দেন। মায়ের কথা খুব মনে পড়ে তখন। নিজের অজান্তেই প্রত্যেকবার কেঁদে ফেলি। এই একটা অনুভূতি সেখানে গেলে নিয়মিতই অনুভব হয় আমার। তাদের জন্যও কিছু করতে পারলে আমার ভীষণ ভালো লাগে। সেদিন এক বৃদ্ধা আমাকে ডেকে বললেন, "সুমন, এদিকে একটু আয় তো, বাবা। ছেলের জন্য একটা চিঠি লিখেছি। কষ্ট করে পৌঁছে দিবি?"

অনুশোচনা

ত্বহেরা তাবাসসুম

রাত সাড়ে দশটা বাজে। সালেহা বেগম রবিনকে বারবার কল দিচ্ছেন, কিন্তু সে কল রিসিভ করছে না। উপায় না পেয়ে তিনি রবিনের বাবা রফিকুল ইসলামকে কল দিলেন। সালাম দিয়ে বললেন, "রবিনের সাথে কি আপনার কথা হয়েছে?"

রফিক সাহেব সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "না তো! কেন কিছু হয়েছে?"

সালেহা বেগম ভয়ার্ত স্বরে বললেন, "ও এখনো বাসায় আসেনি। অনেকক্ষণ ধরে কল দিচ্ছি, কিন্তু কল তুলছে না।"

কথাটি শুনে রফিক সাহেব যেন চমকে গেলেন। বললেন, "ও তো কখনো এত রাত বাইরে থাকে না। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখি, ইনশাআল্লাহ।"

রফিক সাহেব ও সালেহা বেগম দুজনই লাগাতার কল দিতে লাগলেন। কল না ধরায় তারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

রবিন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সবে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে পা রেখেছে। নম্র, ভদ্র ও মেধাবী ছেলে হিসেবেই সে পরিচিত।

রাত এগারোটা বাজে।

রবিন দ্রুতপায়ে বাসায় ঢুকেই রুমে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সালেহা বেগম রবিনের পথ আটকে সামনে দাঁড়ালেন। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

রবিন ব্যস্তস্বরে উত্তর দিল, "বাইরে ছিলাম।"

সালেহা বেগম আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে কোথায় ছিলে? আর কতক্ষণ ধরে কল দিচ্ছি! কল তুলছো না কেন?"

রবিন বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, "আম্মু, সরো তো! আমায় রুমে যেতে দাওI"

সালেহা বেগম উচ্চস্বরে বললেন, "সরবো মানে! কয়টা বাজে এখন? এত রাতে বাইরে কী করছিলে?"

রবিন কোনো কথা বলল না। তার নীরবতায় সালেহা বেগম আরো রেগে গেলেন।

এ ঘোর আঁধারের

তাওহিদা তাবাসসুম

'I want my man with a smart humour.'

লেখাটা পোস্ট করে ফেসবুক থেকে বের হয়ে আসলাম। আসরের আজান হয়ে গেছে, নামাজ পড়তে হবে। নামাজ শেষ করে আসতেই দেখলাম, সুবাহ এই ফাঁকে দুইবার কল দিয়ে ফেলেছে।

কলের নোটিফিকেশন স্কিপ করে মেসেঞ্জারে ঢুকলাম। আমার পোস্টের জের ধরে ইতোমধ্যে কয়েকজন মেসেজ দিয়েছে। মুচকি হাসলাম আর ভাবলাম, এদের মধ্যে থেকে কি কেউ আমার ম্যান হতে পারবে?

ইদানীং একাকিত্ব বেশ জেঁকে বসেছে আমার উপর, একজন সঙ্গী দরকার। এজন্য ভাবছি যে, একটা প্রেম করব। প্রেম আর খারাপ কী! সবাই তো করে! দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে মেসেজগুলো একে একে সীন করলাম। প্রথম মেসেজ, "লোকেরা বলে আমার হিউমার ভালো, চাইলে আপনি যাচাই করে নিতে পারেন।"

মেসেজটা ভালো না লেগে বরং খানিকটা ছ্যাঁচড়ামো লাগল, এটা এড়িয়ে গেলাম। পর্যায়ক্রমে কয়েকটা মেসেজ দেখলাম, কিন্তু একটাও পছন্দ হলো না। তারপরও হাল ছেড়ে দিলাম না। শেষমেশ একটা মজার মেসেজ পেলাম। পড়া শুরু করতেই সুবাহ আবারও ফোন করল। এবার আমি রিসিভ করলাম, সুবাহ হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, "একটু বড় মাঠে আসতে পারবি? দেখা করতে হবে, আর্জেন্ট।"

"ঘণ্টা দুয়েক আগেই তো আমরা ভার্সিটি থেকে ফিরলাম। আর্জেন্ট দেখা করার কিছু তো বললি না। কী হয়েছে এখন?"

"এত কথার সময় নেই, তুই আয়।"

"আসব তো, কিন্তু তার আগে কারণটা বল। আম্মুকে বলে বাসা থেকে বের হতে হবে না?"

সুবাহ হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিলল। ওকে না দেখেও যেন আমি সব বুঝতে পারছি। তারপর বলল, "দোস্ত, রাকিব, লামিম, আয়াশ সবাইকে আনফ্রেন্ড এবং

গন্তব্য জান্নাত

উম্মে হানি

মিঠাইপুর। বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তবর্তী একটি ছোট্ট শহর। শহরটির এক প্রান্তে নদীর ধারে সুন্দর, ছিমছাম একটি পার্ক। সেই পার্কে বিকেলের সোনা রোদ গায়ে মেখে কিছু ছাত্র-ছাত্রী গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। ওরা আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে কে কী করবে, কোথায় বেড়াতে যাবে সেসব নিয়ে কথা বলছে। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে। আমি আজকে বাসায় চলে যাচ্ছি।"

সবাই হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার গল্পে মেতে উঠল দলটি। কিন্তু মেয়েটি যে ওদেরকে মিথ্যা বলেছে সেটা কেউ বুঝতে পারল না।

আসলে মেয়েটি ভয় পেয়েছে। ওখানে বসে থাকার সময় কিছুটা দূরে একটা গাছের নিচে কয়েকজন লোককে বারবার ওর দিকে তাকাতে দেখেছে। ওদের দৃষ্টিটা ছিল অন্যরকম। ওকে গভীরভাবে দেখছিল আর কী যেন বলছিল। তাই সে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে আসে।

মেয়েটির নাম সানিয়া। সে যেমন রূপবতী আর তেমন অবাধভাবে চলাফেরা করে। এমন দৃষ্টির মুখোমুখি সে প্রায়ই হয়ে থাকে। গরিব বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান সে। করোনার লকডাউনের ভয়াবহ দিনগুলো পার করে সম্প্রতি তার বাবা একটি বেসরকারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। একটি ছোট্ট টিনশেড বাসা ভাড়া নিয়ে তারা একসাথে বসবাস করে।

সানিয়া ক্লাস নাইনে পড়ে। মেধাবীও বটে। ইন্টারভিউ দিয়ে ভালো একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। একমাত্র সন্তান হওয়ায় বাবা-মা তার সমস্ত আদর-আহ্লাদ পূরণ করার চেষ্টা করেন। আর তাই সে সবসময় দামি পোশাক, উন্নতমানের কসমেটিক্স আর ব্র্যান্ডের জুতা পরে। তাকে দেখে কখনোই মনে হয় না যে, তার বাবাকে মাসের শেষদিকে ঋণ করে চলতে হয়।

"এই মেয়ে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি সানিয়া না?"

পরদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা গলির বাঁক ঘুরতেই লোকটার মুখোমুখি হলো সানিয়া। সেই লোকগুলোর একজন, গতকাল বিকেলে পার্কে

স্রোতের বিপরীতে

সানজিদা সাবিহা

এক দমকা বাদলা বাতাস এসে টিপটিপ করে জ্বলতে থাকা প্রদীপটা ফস করে নিভিয়ে দিলো। মুহূর্তেই ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেল। জানালার গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে কায়রা। ফাঁকা দৃষ্টি। তবুও আবছা ছায়ার মতো কিছু একটা তার চোখে ধরা দিচ্ছে। দূরের এক ছাদে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে একটা শিশু।

একটু নড়েচড়ে আরাম করে বসতে গেলেই তার সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করে উঠল। সেই সাথে মুখ দিয়ে মৃদু আওয়াজে 'উফ' শব্দ বেরিয়ে আসলো। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের হাসিতে ছেয়ে গেল তার মুখশ্রী।

হাসিখুশিতে মেতে থাকা কায়রা এখন অতিশয় নিশ্চুপ। নিজেকে বেশ গুটিয়ে নিয়েছে সে। যতটুকু না চললেই নয় ততটুকুই ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরটা বয়ে বেড়ায়।

এক সন্ধ্যা রাতের হলুদ আলো মাথায় নিয়ে কায়রা এই বাড়ির দুয়ারে এসে থেমেছিল। কত স্বপ্ন, কত আশা সেদিন তার চোখের কোণে চিকচিক করছিল। অথচ আজ সব স্বপ্ন-আশা পরিণত হয়েছে চোখের নোনতা জলে। ভেবেছিল প্রিয়তমের ভালোবাসার পরশে তার শরীর মৃদু কেঁপে উঠবে। তার ভাবনা সবটুকু পূরণ না হলেও কিঞ্চিৎ হয়েছে বটে।

বিয়ের সাত মাসে প্রতিটা দিনই কায়রা কেঁপে উঠছে। তবে সেটা প্রিয়তমের ভালোবাসার আলতো ছোঁয়ায় নয়, বরং বেল্টের ক্ষিপ্ত আঘাতে। শরীরে সুচ ফেলার মতো জায়গা আছে কি-না সন্দেহ। সমস্ত শরীর জুড়েই লেপ্টে আছে কালো আঘাতের দাগ। দিন গড়িয়ে সেগুলো এখন কয়লার রূপ ধারণ করেছে।

কায়রা উঠে দাঁড়ায়। তার যে এভাবে বসে থাকলে চলবে না। চুলায় রান্না চড়াতে হবে শিগগির। নয়তো আরও দু'চার ঘা তার পিঠের উপর পড়বে।

সবে ক'দিন হলো কায়রা উত্তাল তরঙ্গের মতো বহমান যৌবনে পা দিয়েছে। পাখা ঝাপটিয়ে ছুটে বেড়ানোর এই তো সময়। নানা অজানাকে জানার এই বয়সে সে-ও বড্ড ছটফটে। মুক্ত উড়ন্ত এক পাখি। এ-ডাল থেকে ও-ডালে নতুন পাখির সন্ধানে উড়ে বেড়ায়। তেমনি একদিন তার পরিচয় ঘটে এক নতুন জগতের সাথে। ভিন্ন রকমের অনুভূতির সাথে।

ভয়াবহ ফিতনা

আমাতুল্লাহ সিহিন্তা

বিছানার এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল মিম। দশদিন হলো তার এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে। কাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ ফলাফলই এসেছে। এটা শুধু তারই নয়, পরিবারের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলই বটে।

মইনুল সাহেব আবার ধমক দিয়ে বললেন, "আমি যেন আর মাদরাসার কথা না শুনি! কলেজে আবেদনের আর দু'দিন বাকি আছে। আজই তোমার বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ করে আবেদন করে ফেলো। আর মনে রেখো, তোমাকে এই কলেজেই পড়তে হবে। আমি তোমায় না মাদরাসায় ভর্তি হতে দেবো, আর না মহিলা কলেজে!"

বলেই মইনুল সাহেব রুম থেকে চলে গেলেন। মিম ফাঁকা দৃষ্টিতে বাবার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিকালে আবারও মইনুল সাহেব মিমের রুমে এলেন। মিম বসে বসে কিছু একটা লিখছিল। বাবাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল সে। মইনুল সাহেব তাকে লক্ষ করে বললেন, "ভর্তি কবে?"

মিম চোখ নামিয়ে ফেলল। নিম্নস্বরে বলল, "আমি এখনো আবেদন করিনি, বাবা!"

তৎক্ষণাৎ রেগে গেলেন মইনুল সাহেব। তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, "তুমি বাংলা কথা বোঝো না? বেয়াদব মেয়ে! বাবার কথা না শোনার জন্য কি ইসলামে শাস্তির বিধান নেই? এত ইসলাম মেনে কী লাভ, যেখানে বাবা-মায়ের কথাই শোনো না! তোমার কারণে আমার ছোট ছেলেমেয়ে তিনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাল যদি আবেদন না করো, তাহলে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে। আমার এমন খারাপ মেয়ের দরকার নেই!"

কথা শেষ হতেই মইনুল সাহেব রুম থেকে চলে গেলেন। মিমের চোখ ভিজে গেল। ভাই-বোনদের আর ভালো হয়ে চলতে বলবে না সে! সামান্য অভিমান হলো।

পরের দিন বিকালে মিমের ছোট খালামণি ফাতেমা এলো। ফাতেমা মিমের রুমে এসে দেখল, সে চুপচাপ বসে আছে। পাশে এসে বসতেই মিম অসহায় চোখে তাকাল। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। খালামণিকে দেখে কোনো রকমে

শেষ থেকে শুরু

ফাহমিদা আফরিন

লেখা শেষ করে কলমের ক্যাপ লাগিয়ে পাশে রেখে দ্বিতীয়বারের মতো ডায়েরির পাতাটায় চোখ বোলাতে শুরু করে তানিশা।

১৮ অক্টোবর, ২০২২

নিজের ভুল সিদ্ধান্তের কথা ভেবে আজ খুব আফসোস হচ্ছে। রুমির দেওয়া পরামর্শগুলো মানলে হয়তো এমন পরিস্থিতি আসত না। এই আফসোস আমৃত্যু আমাকে পুড়িয়ে ছারখার করবে। আজ রুমির কোলে ফুটফুটে বাচ্চাটাকে দেখে বুকের ভেতরটা বড্ড খাঁখাঁ করছে। সেদিন নিজেই নিজের সন্তান, সংসার সবকিছু শেষ করেছি। আজ হয়তো তারই শাস্তি ভোগ করছি। হয়তো আমার গল্পটা অন্যরকম হতে পারত। হয়তো আমার কোলেও একটা ছোট্ট পুতুল থাকত! হয়তো...

আর কিছু লেখা হয়নি। শুধু শেষ লাইনের উপর দু'ফোটা নোনাজল পড়ে আছে।

হঠাৎ ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘরের দরজা খুলে গেল। তানিশা অতি দ্রুত চোখ মুছে ডায়েরিটা বন্ধ করে রাখল। ছোটবোন তাসনিম ইতোমধ্যেই তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"মা সেই কখন থেকে তোমাকে ডাকছে, যাচ্ছো না কেন?"

তানিশা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমি আসছি, তুই যা।"

তাসনিম ভ্রু কুঁচকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তানিশাও বের হলো।

"কী ব্যাপার! তোর কি খিদে-টিদে পায় না? কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছি," বাবা সামান্য রাগান্বিত হয়ে বললেন।

"এই তো এসে গেছি, বাবা।"

প্রায় দশ মিনিট যাবৎ যে তানিশা কেবল খাবার নেড়েই যাচ্ছে, একদানাও মুখে নিচ্ছে না এটা বাবা-মা লক্ষ করলেন। মেয়েটাকে নিয়ে তারা বেশ চিন্তিত। দু-

শর্টকাট ফিতনা

সুরাইয়া আক্তার সুরভী

নীল শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চোখে কাজল টানছে রাফেদা। তার চোখে-মুখে খুশির ছাপ। এত খুশির কারণ হলো, আজ রাজুর জন্মদিন। সামনেই রাজুর জন্য রঙিন কাগজে মোড়ানো একটা গিফট রাখা।

রাফেদা আর রাজু একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। রাজু রাফেদার এক বছরের সিনিয়র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাদের দুজনকে প্রায় সময়ই একসাথে দেখা যায়।

রাফেদা রাজুকে নিজের ভাইয়ের মতোন সম্মান করে। তার সাথে সব কথা ভাগাভাগি করে। আর রাজুও রাফেদার সব কথা গুরুত্বের সাথে শোনে, সমস্যায় পড়লে সমাধান করে। এভাবে সে ভাই হিসেবে রাফেদার কাছে খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, রাফেদার পরিবারের সাথেও রাজুর প্রচুর খাতির হয়ে গেছে।

কিন্তু শুধু রাজুর সাথেই রাফেদার এমন ভালো সম্পর্ক নয়। ভাই-বোনের সম্পর্কের নামে তার বোনের স্বামী, চাচাতো, খালাতো, মামাতো ভাই এবং ফেসবুকের চেনা-অজানা মানুষদের সাথেও তার গভীর সম্পর্ক।

নারী মানেই সৌন্দর্যের বাগিচা। আর তাকে যদি আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায়, তখন চোখ যেন ফেরানো যায় না। আর এই সৌন্দর্য কখনো কারো চক্ষুশীতল করার কারণ। আবার কখনো কারো জীবন জ্বালিয়ে দেওয়ার কারণ।

সাজগোজ শেষ হতেই রাফেদা উঠে দাঁড়াল। নীল শাড়িতে তাকে অপরূপ সুন্দরী লাগছে। নিশ্চয়ই রাজু তাকে দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকবে। ভাবতেই রাফেদার ভীষণ ভালো লাগছে।

আসলে রাজুকে তার বেশ ভালো লাগে। ভাইবোনের সম্পর্ক হলেও রাফেদা রাজুর ছোট-খাটো আবদার পূরণ করার চেষ্টা করে। এই যেমন, একসাথে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, রাজুর ইচ্ছেয় শাড়ি পরা, রাত-বিরাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলা সবই চলে। এটা তাদের নিত্যদিনের কাজ, তাই আর অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় না।

গিফট বক্স হাতে নিয়ে রাফেদা রাজুদের বাসা উদ্দেশে রওয়ানা দিল। এক ঘণ্টার পথ। সে রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিএনজিতে উঠে বসতেই সে এক বোরকা পরিহিত মেয়েকে দেখতে পেল। বোরকা আবৃত থাকায় মেয়েটার বয়স